সঞ্চয়িতা

বিষয় কোড : ০০২

['সাধারণ' এবং 'সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত' ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য]

পূর্ণমান : ২০০

নির্ধারিত সময় : ৪ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য : বাংলা ভাষায় উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

নম্বর

১. **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন :** ৬ × ৫ = ৩০

** নির্দেশনা :

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

ii. ভুল বানান, বাক্য ও অর্থ ঠিক করে দিবেন প্লিজ

ক. **বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে তৎসম অথবা অ-তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন।**

নমুনা উত্তর :

১. তৎসম শব্দ

১.১ এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

১.২ যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ, কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন হবে। যেমন : কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র; উর্ণা, উষা।

১.৩ রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্জ্জন, উর্দ্ধ, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য হবে না। এগুলোর পরিবর্তে অর্জন, উর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য হবে।

১.৪ সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন : অহম্ + কার = অহংকার; একইভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।

সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে (ং) হবে না। যেমন : অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

১.৫ সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুযায়ী সেগুলিতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন : গুণী ⟶ গুণিজন; প্রাণী ⟶ প্রাণিবিদ্যা; মন্ত্রী ⟶ মন্ত্রিপরিষদ। তবে এগুলির সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন : গুণী⟶গুণীজন; প্রাণী ⟶ প্রাণীবিদ্যা; মন্ত্রী ⟶ মন্ত্রীপরিষদ।

ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে -ত্ব ও -তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন : কৃতি ⟶ কৃতিত্ব; দায়ী ⟶ দায়িত্ব; প্রতিযোগী ⟶ প্রতিযোগিতা; মন্ত্রী ⟶ মন্ত্রিত্ব; সহযোগী ⟶ সহযোগিতা।

১.৬ বিসর্গ (ঃ) : শব্দের শেষে বিসর্গ থাকবে না। যেমন : ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত। এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন : দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস।

২. অতৎসম শব্দ

২.১ ই, ঈ, উ, ঊ : সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন ব্যবহৃত হব। যেমন : আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ,

২.২ এ, অ্যা : বাংলায় 'এ' বর্ণ বা এ-কার দিয়ে 'এ' এবং 'অ্যা' উভয় ধ্বনিই নির্দেশিত হয়। যেমন : কেন, কেনো (ক্রয় করো); খেলা, খেলি; গেল, গেলে, গেছে; দেখা, দেখি; জেনো, যেন।

২.৩ ও : বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন : কালো, খাটো, ছোটো, ভালো; এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো; করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো, বসানো, শেখানো, শোনানো, হাসানো; কুড়ানো, নিকানো, বাঁকানো, বাঁধানো, ঘোরালো, জোরালো, ধারালো, প্যাঁচানো; করো, চড়ো, জেনো, ধরো, পড়ো, বলো, বসো, শেখো; করাতো, কেনো, দেবো, হতো, হবো, হলো; কোনো, মতো।

২.৪ ং, ঙ : শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন : গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।

তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে 'ঙ' হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।

২.৫ ক্ষ, খ : অতৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

২.৬ জ, য : বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন : কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার।

২.৭ মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন : অতৎসম শব্দের বানানে 'ণ' ব্যবহার করা যাবে না। যেমন : অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ 'ণ' হয়; যেমন : কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন।

২.৮ শ, ষ, স : বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন : কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শামিয়ানা, শার্ট, শৌখিন; আপস, জিনিস, মসলা, সন, সাদা, সাল (বৎসর), স্মার্ট, হিসাব; স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর; ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, সালাত, সালাম; এশা, শাওয়াল, শাবান।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি S ধ্বনির জন্য স এবং -sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন : পাসপোর্ট, বাস; ক্যাশ, টেলিভিশন, মিশন, সেশন, রেশন, স্টেশন।

২.৯ বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ : বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন: স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং। তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষ করা যায়। যেমন : মার্কস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল।

২.১০ হস-চিহ্ন : হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। যেমন : কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক, ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ, হক। তবে যদি অর্থবিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : উহ্, বাহ্, যাহ্।

২.১১ ঊর্ধ্ব-কমা : ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আইল)।

খ. **অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।**

নমুনা উত্তর :

কিছু অর্থবোধক ধ্বনি বা বর্ণের সমষ্টি যা একটি বাক্য গঠনের মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে, তাকে শব্দ বলে। অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: যৌগিক, রূঢ় বা রূঢ়ি এবং যোগরূঢ়।

১. যৌগিক শব্দ : যেসব শব্দের বুৎপত্তিগত (উৎপত্তিগত) অর্থ এবং ব্যবহারিক অর্থ একই থাকে।
উদাহরণ: কর্তব্য (যা করা উচিত), গায়ক (যিনি গান করেন), মিঠাই (মিষ্টি)।

২. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ : যেসব শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে গঠিত হওয়ার পরও তাদের মূল অর্থটি হারিয়ে ফেলে এবং একটি বিশেষ বা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।
উদাহরণ: হস্তী (বুৎপত্তিগত অর্থ: হাত আছে যার; প্রচলিত অর্থ: একটি বিশেষ প্রাণী/হাতি)। বাঁশি (বুৎপত্তিগত অর্থ: বাঁশ দিয়ে তৈরি; প্রচলিত অর্থ: বাদ্যযন্ত্র)।

৩. যোগরূঢ় শব্দ : যেসব শব্দ সমাস বা প্রত্যয়যোগে গঠিত হওয়ার পর সমস্যমান পদসমূহের সাধারণ অর্থকে না বুঝিয়ে একটি বিশেষ বা নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে।
উদাহরণ: পঙ্কজ (সাধারণ অর্থ: যা কাদায় জন্মায়; প্রচলিত অর্থ: পদ্মফুল)। জলধি (সাধারণ অর্থ: যা জল ধারণ করে; প্রচলিত অর্থ: সমুদ্র)।

গ. **নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন :**

i. তদানীন্তনকালে বাঙালি ব্রিটিশদের অধীন ছিলো।
শুদ্ধ : তৎকালে/ তদানীন্তন বাঙালি ব্রিটিশদের অধীন ছিল ।

ii. গাছটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
শুদ্ধ : গাছটি সমূল/ মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।

iii. শুধুমাত্র টাকা হলেই বিদ্যা অর্জন হয় না।
শুদ্ধ : শুধু টাকা হলেই বিদ্যা অর্জন হয় না।

iv. আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।
শুদ্ধ : আমরা তার বিদেহ আত্মার শান্তি কামনা করছি।

v. ফলজ বৃক্ষ বেশি বেশি লাগাতে হবে।
শুদ্ধ : ফলদ বৃক্ষ বেশি বেশি লাগাতে হবে।

vi. প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা থাকবেই।
শুদ্ধ : প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই।

ঘ. **নিচের বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলোর অর্থ উল্লেখ করে বাক্যে প্রয়োগ দেখান :**

সাপে-নেউলে; ভূষণ্ডির কাক; তুষের আগুন; ঢাক ঢাক গুড় গুড়; ঝাঁকের কই; পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে।

সাপে-নেউলে : (ভীষণ শত্রুতা) – দুই ভাইয়ের এখন সাপে নেউলে সম্বন্ধ।

ভূষণ্ডির কাক : (দীর্ঘজীবী; বহুদর্শী) সব অধ্যাপকই ভূষণ্ডির কাক হতে পারে না।

তুষের আগুন : (দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা) পরীক্ষায় ফেলের জন্য বাবার তিরস্কারে সুমনের মনের তুষের আগুন জ্বলছে।

ঢাক ঢাক গুড় গুড় : (লুকোচুরি বা গোপন রাখার চেষ্টা) ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় করে কী লাভ, আসল কথাটি বল।

ঝাঁকের কই : (একই দলের লোক) পরীক্ষা পিছানোর ব্যাপারে সবাই ঝাঁকের কই সাজে।

পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে : (অভিজ্ঞ লোকের গুন) দাদুর যুক্তিই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগল- আসলে পুরোনো চালই ভাতে বাড়ে।

ঙ. **পাশে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে বাক্যগুলো রূপান্তর করুন :**

১. যে রক্ষক, সেই ভক্ষক।
সরল : রক্ষকই ভক্ষক।

২. তিনি আরম্ভ কাজ শেষ করে যাবেন।
জটিল বাক্য : তিনি যে কাজ শুরু করেছেন, তা শেষ করে যাবেন।

৩. লীনা যে কলমটি হারিয়েছিল, তা পেয়েছে।
যৌগিক বাক্য : লীনা একটি কলম হারিয়েছিল, কিন্তু পরে তা পেয়েছে।

৪. সিলেটে বহু চা-বাগান আছে।
নেতিবাচক বাক্য : সিলেটে চা-বাগানের সংখ্যা কম নয়।

৫. আমি তোমাকে কিছুই দেব না।
অস্তিবাচক বাক্য : আমি তোমাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করব।

৬. একে দিয়ে কি এ কাজ হবে?
নির্দেশাত্মক বাক্য : একে দিয়ে এ কাজ হওয়ার কথা নয়।

২. **ভাব-সম্প্রসারণ করুন :** ২০

** নির্দেশনা :

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে সর্বোচ্চ ১৪ - ১৫ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ৭ - ৮, এভারেজ নম্বর ১০ - ১১।
iii. ৩/৪টি মন্তব্য লিখে দিবেন।

ক. মানুষ বাঁচে তার কর্মে, বয়সের মধ্যে নয়।

মূলভাব : কেবল দীর্ঘ জীবনের মাধ্যমে মানুষ অমরত্ব লাভ করতে পারে না; বরং মহৎ কর্ম ও অবদানই মানুষকে মৃত্যুর পরেও মহাকালের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখে। পৃথিবীতে মানুষের জীবনের সার্থকতা তার বয়স বা দীর্ঘায়ুর ওপর নির্ভর করে না।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষের দৈহিক জীবনকাল অত্যন্ত স্বল্পকালীন এবং নশ্বর। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝের এই ক্ষণস্থায়ী সময়ে মানুষের জীবন যদি কেবল ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস, আত্মসুখ ও আরাম-আয়েশে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সে জীবন তাৎপর্যহীন হয়ে ওঠে। এমন মানুষ যতই দীর্ঘায়ু লাভ করুক না কেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। কারণ, তার জীবন বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে কোনো উল্লেখ করার মতো ছাপ রেখে যেতে পারে না। জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত থাকে কর্মের মাধ্যমে আত্মপ্রসার ঘটানোর মধ্যে। যাঁরা মানবকল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করেন, তাঁরা জানেন যে জীবনের দৈর্ঘ্য দিয়ে নয়, বরং তার গুণগত মান দিয়েই মূল্যায়ন হওয়া উচিত। এই মহৎ হৃদয়ের মানুষরাই সমাজের জন্য কিছু করে যেতে চান। তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সমাজসেবা ও দেশের স্বার্থে মহৎ অবদান রাখেন। তাঁদের কাজের মূল্য তাদের মৃত্যুর পরেও অক্ষুণ্ণ থাকে। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, জীবনকে গৌরবান্বিত করার জন্য বয়সের প্রবীণতা নয়, বরং মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। এই চিরায়ত সত্যের প্রতিধ্বনি করে মনীষীরা বলেন: "Man does not live in years but in deeds." অর্থাৎ, মানুষ বছরের হিসাবে বাঁচে না, বাঁচে তার কর্মের মাধ্যমে। তাঁদের এই কর্মগুণই তাঁদের দীর্ঘায়ু বা চিরজীবী করে তোলে।

উদাহরণস্বরূপ, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কিংবা আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের কালজয়ী সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে অমর হয়ে আছেন। একইভাবে, সমাজসেবা ও মানবতার ক্ষেত্রে আব্রাহাম লিঙ্কন বা মাদার তেরেসা তাঁদের আত্মত্যাগের জন্য স্মরণীয়। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এর নজির রয়েছে: বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে শহিদ রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার কিংবা তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য—তাঁরা স্বল্প আয়ুর জীবনে দেশ ও জাতির জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা তাঁদের চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। এই দৃষ্টান্তগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, মহৎ কর্মের মাধ্যমে যাঁরা জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলতে পারেন, তাঁরাই প্রকৃত অর্থে দীর্ঘজীবী বা চিরজীবী।

মন্তব্য : স্বীয় কীর্তির মাধ্যমে মানব হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান পাবার মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। দৈহিক জীবনের আয়ু নয়, বরং মহৎ কর্মের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করাই মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

অথবা,

খ. **স্বদেশের উপকারে নাই যার মন**
কে বলে মানুষ তারে? পশু সেইজন।

মূলভাব : জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এ গুণ যার মধ্যে নেই, সে দেশ বা জাতির কাছে মানুষ হিসেবে তুচ্ছ। স্বদেশপ্রেম মানবচরিত্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ। যে ব্যক্তি স্বদেশের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করে, সে কখনো দেশের উপযুক্ত নাগরিক হতে পারে না।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষ জন্মগ্রহণের পর থেকেই স্বদেশের মাটি, বাতাস ও আলো-পানি নিয়ে বড় হয় এবং এই প্রাকৃতিক সম্পদে তার জীবন পরিপুষ্ট হয়। জন্মভূমি মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত; তাই স্বদেশের প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা জন্মায়—যা একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। যেসব মহৎ গুণ অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে আলাদা করেছে, তার একটি হচ্ছে এই স্বদেশপ্রেম। যে স্বদেশ তাকে মায়ের মতো গভীর ভালোবাসায় নিজেকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়, তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ সকলের থাকা উচিত। তাই স্বদেশকে ভালোবাসা, দেশ ও জাতির উন্নতির জন্যে কাজ করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। স্বদেশের জন্যে মানুষের এই ভালোবাসা প্রকাশ পায় দেশের ও দেশবাসীর অগ্রগতি ও কল্যাণের জন্য দেশপ্রেমিকের চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক দেশের জন্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দেন। দেশের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার মুহূর্তে প্রয়োজনে নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও তিনি দ্বিধা করেন না। সে কারণেই ১৯৭১ সালে স্বদেশপ্রেমী নাগরিকরা অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে নিজ মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হননি। আমাদের দেশের মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহিদেরা দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে স্মরণীয়-বরণীয় হয়েছেন।

অন্যদিকে, স্বদেশের প্রতি যার মমত্ববোধ নেই, সে দেশের কল্যাণের ব্যাপারে বিমুখ থাকে। তারা নিতান্তই আত্মসর্বস্ব ও স্বার্থপর মানুষ। স্বদেশপ্রেমবিহীন মানুষ প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্ব বিবর্জিত পশু বলে পরিচিত হয়। এ ধরনের মানুষ দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও দ্বিধাবোধ করে না এবং দেশের ক্ষতি সাধনেও পিছপা হয় না। তাদের কারণে দেশের মানুষের অনিষ্ট সাধিত হয় ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। তাই তারা সমাজের কাছে মর্যাদার আসন পেতে পারে না; বরং সে পায় মানুষের ঘৃণা ও নিন্দা। দেশদ্রোহীরা পশুর মতোই আচরণ করেছে। বস্তুত, দেশের জন্যে কাজ করতে পারলেই সত্যিকারের মানুষের মতো মানুষ হওয়া যায়।

মন্তব্য : মায়ের কাছে সন্তান যেমন চিরঋণী, ঠিক তেমনি স্বদেশের কাছেও আমরা চিরঋণী। স্বদেশপ্রেমহীন মানুষ আর পশুতে কেবল পার্থক্য আকৃতির। যাদের অন্তরে দেশপ্রেম নেই তারা মানুষ নামের কলঙ্ক। এজন্যেই মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরা বলে গেছেন: "জননী, জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী।" স্বদেশকে ভালোবাসাই মানুষের প্রকৃত ধর্ম।

৩. **সারমর্ম লিখুন :** ২০

** **নির্দেশনা :** ৩/৪টি সরল বাক্যে সারমর্ম লিখতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর ১২-১৪, এভারেজ নম্বর ৯-১১। প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে।

ক. অধম রতন পেলে কি হইবে ফল?
উপদেশে কখনও কি সাধু হয় খল?
ভালো মন্দ দোষগুণ আঁধারেতে ধরে,
ভুজঙ্গ অমৃত খেলে গরল উগরে
লবণ জলধি জল করিয়া ভক্ষণ
জলধর করে দেখ সুধা বরিষণ।
সুজনে সু-যশ গায় কু-যশ ঢাকিয়া
কুজনে কুরব করে সু-রব নাশিয়া।

সারমর্ম : অন্যের ভালো দিকগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হওয়াই সৎ লোকের ধর্ম। আর মন্দ লোকের ধর্ম হল অন্যের খুঁত খুঁজে বের করে তা প্রচার করে বেড়ানো। বস্তুত জগতে ভালো ও মন্দ লোকের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যই আলাদা।

অথবা,

খ. **সারাংশ লিখুন :**

** **নির্দেশনা :** ৩/৪টি সরল বাক্যে সারাংশ লিখতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর ১২-১৪, এভারেজ নম্বর ৯-১১। প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে।

এ দেশের লোকে যে যৌবনের কপালে রাজটিকার পরিবর্তে তার পৃষ্ঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে যে, আমাদের বিশ্বাস মানব জীবনে যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া– কোন রকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কী জ্ঞানী, কী অজ্ঞানী সকলেই চান যে, এক লম্ফে বাল্য হতে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হন। যৌবনের নামে আমরা ভয় পাই, কেননা তার অন্তরে শক্তি আছে। অপর পক্ষে বালকের মনে শক্তি নেই, বৃদ্ধের দেহে শক্তি নেই, বালকের জ্ঞান নেই, বৃদ্ধের প্রাণ নেই। তাই আমাদের নিয়ত চেষ্টা হচ্ছে দেহের জড়তার সঙ্গে মনের জড়তার মিলন করা, অজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞতার সন্ধি স্থাপন করা। তাই আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঁচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকানো।

সারাংশ: যৌবনকে যারা হৃদয়ে ধারণ করেছে তারাই তরুণ। দেশ, কাল, ধর্ম, জাতি সব কিছুর ঊর্ধ্বে তরুণের অবস্থান। যৌবনের এই ধর্মই মানুষকে করে তুলেছে মহামানব, তাকে স্থান দিয়েছে সকল মানুষের হৃদয়ে।

৪. **নিচের প্রশ্নগুলি থেকে যে কোন দশটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:** ৩×১০ = ৩০

** নির্দেশনা :

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে সর্বোচ্চ ২.৫ - ৩ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ০.৫ - ১, এভারেজ নম্বর ১.৫ - ২।
iii. প্রশ্নের উত্তরে কবি-সাহিত্যিকের পঙক্তি উদ্ধৃত করলে সেগুলির বানান সঠিক আছে কিনা তা দেখে নিবেন প্লিজ।
iv. প্রশ্নের উত্তরে ভুল লিখলে তা সংশোধন করে দিবেন প্লিজ।
v. প্রতিটি প্রশ্নে ২/৩টি মন্তব্য লিখে দিবেন।

ক. বাংলা সাহিত্যে 'অন্ধকার যুগ'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে মতামত দিন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'অন্ধকার যুগ' বলতে সাধারণত ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৫০ বছরের সময়কালকে বোঝানো হয়।

'অন্ধকার যুগ' বলার কারণ ও বিতর্ক :

বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন অভাব: এই সময়কালের কোনো প্রত্যক্ষ সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। তুর্কি আক্রমণের (১২০৩ খ্রিস্টাব্দ) পর দেশে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়, তার ফলে সাহিত্যচর্চা কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

রাজনৈতিক অস্থিরতা: এই সময়ে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের পর বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যজুড়ে বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধ এবং শাসকদের ঘন ঘন পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হয়ে যায়।

সাংস্কৃতিক স্থবিরতা: এই পরিস্থিতিতে জীবন ও জীবিকা নিয়েই মানুষ ব্যস্ত ছিল, যার ফলে কোনো নতুন সাহিত্য সৃষ্টি বা পুরানো পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি।

রূপান্তর ও মৌখিক সাহিত্য: এটি ছিল বাংলা ভাষার রূপান্তরের কাল। লিখিত সাহিত্য না থাকলেও, ছড়া, ধাঁধা ও লোকগানের মতো মৌখিক লোকসাহিত্য প্রচলিত ছিল।

যদিও লিখিত নিদর্শনের অভাবে এই সময়কাল 'অন্ধকার যুগ' নামে পরিচিত, তবে বর্তমানে একে 'রূপান্তরের কাল' বা 'অজ্ঞাত যুগ' বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হয়।

খ. "কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥" চর্যাপদের এ পদটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করুন।

"কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল। / চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥"

পদটি চর্যাপদের আদি কবি লুইপা রচিত চর্যাপদের প্রথম পদের অংশ। পদটির সাধারণ অর্থ হলো, দেহ শ্রেষ্ঠ বৃক্ষস্বরূপ, এর পাঁচটি ডাল আছে; কিন্তু এই চঞ্চল চিত্তের মধ্যে কাল বা মৃত্যু প্রবেশ করে। তবে চর্যাপদ যেহেতু বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনতত্ত্বের গূঢ় রহস্য প্রকাশের জন্য সন্ধ্যা ভাষায় রচিত হয়েছিল, এর মর্মার্থ রূপক ও সাংকেতিক। এখানে 'কাআ তরুবর' বা দেহকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যার 'পঞ্চ বি ডাল' হলো পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বা পঞ্চস্কন্ধ। এই পাঁচটি ডালই হলো আসক্তি ও বন্ধনের উৎস, যা মানুষকে সংসারচক্রে আবদ্ধ করে রাখে।

কবি লুইপার মতে, মুক্তির জন্য চিত্তকে একাগ্র করা আবশ্যক। 'চঞ্চল চীএ' অর্থাৎ অস্থির মন বা চিত্ত যখন ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হয়, তখনই 'কাল' (মৃত্যু বা বিনাশ) সেই দেহে প্রবেশ করে, যা জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ, যতক্ষণ চিত্ত চঞ্চল থাকবে এবং বাহ্যিক বিষয়ে আকৃষ্ট হবে, ততক্ষণ মুক্তিলাভ অসম্ভব। তাই এই পদটির মাধ্যমে কবি মানবদেহের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং চিত্তের চঞ্চলতা দূর করে নির্বাণ লাভের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।

গ. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রোসাঙ্গ-রাজসভার প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করুন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রোসাঙ্গ-রাজসভা (আরাকান রাজসভা) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক স্থান অধিকার করে আছে, বিশেষ করে মধ্যযুগে এর পৃষ্ঠপোষকতা বাংলা সাহিত্যকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল।

রোসাঙ্গ (বর্তমান মিয়ানমারের আরাকান) রাজসভা ছিল মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের এক উজ্জ্বল কেন্দ্র। সপ্তদশ শতকের শুরুতে মোগলদের আক্রমণের মুখে বহু কবি, পণ্ডিত ও উচ্চবর্গীয় মুসলিম ব্যক্তিবর্গ চট্টগ্রাম থেকে এই স্বাধীন রাজ্যে আশ্রয় নেন। আরাকানের বৌদ্ধ রাজা ও তাদের মন্ত্রীরা, যারা বাংলায় পারদর্শী ছিলেন, উদারভাবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই সময়কার বিখ্যাত কবিরা ছিলেন দৌলত কাজী এবং মহাকবি আলাওল।

রোসাঙ্গ-রাজসভার সাহিত্যকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা, লোকজীবন এবং মানবতাবাদ। এই রাজসভার কবিরা ফারসি, আরবি ও হিন্দি সাহিত্যের বিখ্যাত প্রেমমূলক আখ্যানগুলি বাংলায় অনুবাদ করে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। মহাকবি আলাওল, এই রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি, রচনা করেন 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামান' ও 'সপ্তপয়কর'-এর মতো বিখ্যাত কাব্যগুলি। এই অনুবাদ ও মৌলিক রচনাগুলোতে তৎকালীন সামাজিক জীবনের প্রতিফলন এবং মানবিক প্রেমের গভীরতা প্রকাশ পাওয়ায়, তা মধ্যযুগের গোঁড়া সাহিত্যধারা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিকতার বীজ বপন করেছিল। সুতরাং, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোশকতার অভাবে যখন বৃহত্তর বাংলায় সাহিত্য প্রায় স্থবির ছিল, তখন রোসাঙ্গ-রাজসভা একটি সাংস্কৃতিক রেনেসাঁস ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ন রেখেছিল।

ঘ. 'বীরত্ব ও ট্র্যাজেডি'–মেঘনাদ চরিত্রে এই দুই বৈশিষ্ট্য কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা উল্লেখ করুন।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)-এর প্রধান চরিত্র মেঘনাদ একাধারে ছিল অমিত শক্তিধর ও ত্রিলোকবিজয়ী মহাবীর। তার বীরত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হলো দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে 'ইন্দ্রজিৎ' উপাধি লাভ। কাব্যজুড়ে তার শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং শত্রুকে বারবার পরাজিত করার ক্ষমতা তাকে এক অসাধারণ মহাবীর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার বীরত্বসূচক অহংকার এবং কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ পায় এমন সংলাপে: "রাবণের আমি/ একমাত্র পুত্র!..."। সে বীরের ধর্মকে অক্ষুণ্ন রেখে রণক্ষেত্রে সংগ্রাম করেছে, যা তার বীরসত্তাকে সুদৃঢ় করে।

তবে মেঘনাদের এই বীরত্বই তার ট্র্যাজেডিকে আরও গভীর ও করুণ করেছে। তার পতন বীরত্বের অভাবে নয়, বরং দৈব-নিয়তি ও কাপুরুষোচিত শঠতার কারণে সৃষ্ট। তাকে হত্যা করা হয় নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, যখন সে ছিল নিঃশর্ত ও নিরস্ত্র। লক্ষ্মণ কপটতার আশ্রয় নিয়ে বীরের ধর্ম লঙ্ঘন করে তাকে হত্যা করে। নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত হওয়ার সময় তার ক্ষোভ প্রকাশ পায়: "অস্ত্রহীন আমি, নহি হে ডরিব / কেন?" এই অন্যায় ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যু কেবল মেঘনাদের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি ছিল না, এটি ছিল রাবণসহ লঙ্কা পরিবারের চূড়ান্ত পতন। নিয়তির হাতে এই মহাবীরের করুণভাবে পরাভূত হওয়াই তাকে এক ট্র্যাজিক হিরো হিসেবে বাংলা সাহিত্যে অমরতা দিয়েছে।

ঙ. মীর মশাররফ হোসেনকে কেন বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের পথিকৃৎ বলা হয়?

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১ খ্রি.) ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর এক প্রথিতযশা সাহিত্যিক, যিনি বাঙালি মুসলিম সমাজে আধুনিক সাহিত্যচর্চার পথপ্রদর্শক হিসেবে চিরস্মরণীয়। তাঁকে কেবল একজন লেখক হিসেবে নয়, বরং বাংলা গদ্য ও মুসলিম সাহিত্যের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণের শিল্পী হিসেবে গণ্য করা হয়।

তিনি আরবি-ফারসি নির্ভর পুঁথি সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতে আধুনিক গদ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম লেখক যিনি বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের মতো আধুনিক শাখায় সফলভাবে বিচরণ করেন। তাঁর হাতেই বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকদের লেখা প্রথম উপন্যাস 'রত্নবতী' (১৮৬৯) এবং প্রথম সার্থক নাটক 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) প্রকাশিত হয়, যা পরবর্তী সাহিত্যিকদের জন্য ছিল এক বিশাল প্রেরণা। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১)। এই অমর ট্র্যাজেডিটি কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে লেখা হলেও, এর মূল উপজীব্য হলো বিশ্বজনীন মানবিক শোক, প্রেম ও ট্র্যাজেডি, যা ধর্মীয় গণ্ডি পেরিয়ে পাঠককে মানবতাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। এই সৃষ্টির জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

তাঁর সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের জীবনচিত্র উঠে এসেছে। ভাষা ব্যবহারে তিনি চলিত ও সাধু রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে এক সাবলীল প্রকাশভঙ্গি তৈরি করেছিলেন। তাই মীর মশাররফ হোসেন তাঁর বহুমুখী ও মানবতাবাদী সৃষ্টির মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকদের অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত।

চ. কবি জসীমউদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখুন।

নমুনা উত্তর : কবি জসীমউদ্দীনের বিখ্যাত 'নকশী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হলো গ্রামীণ পটভূমিতে গ্রামীণ যুবক রূপাই ও যুবতী সাজুর অকৃত্রিম প্রেম এবং সেই প্রেমের করুণ বিয়োগান্তক পরিণতি।

গ্রামের সুদর্শন রূপাই এবং প্রাণোচ্ছল মেয়ে সাজুর মধ্যে গভীর প্রেম হয় এবং তাদের বিয়ে হয়। তাদের সহজ-সরল দাম্পত্য জীবন গ্রামীণ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম ছিল। তাদের সেই সুখের ছবি ফুটে উঠেছে এই পঙক্তিতে:
"আশমানেতে গাঙের জলে চান্দের জোছনা ভাসে, রূপাই তাহার বৌকে ডাকে মিছামিছি বসে আসে।"
রূপাই ছিল লাঠিখেলার ওস্তাদ। এক প্রতিপক্ষের সঙ্গে লাঠিখেলার লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ মারা গেলে রূপাইকে গ্রাম ছেড়ে নিরুদ্দেশ হতে হয়। এই অপ্রত্যাশিত সংঘাতই তাদের জীবনের সব সুখ কেড়ে নেয় এবং বিচ্ছেদ ঘটায়।
স্বামীর বিরহে সাজু একাকী জীবনে ডুবে যায়। সে তার হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা, স্মৃতি এবং তাদের প্রেমের কাহিনী সুঁই-সুতো দিয়ে একটি নকশী কাঁথার মধ্যে বুনে তোলে। এই কাঁথাটিই সাজুর বিরহ-বেদনার শিল্পিত দলিল:
"সাজু তারে কত কথা ক'ত, কত কথা কত রাত, কাঁথার উপর লিখিয়া গেল কত হাসি কত নাত।"
বিরহের ভার সইতে না পেরে সাজু শেষ পর্যন্ত সেই নকশী কাঁথার ওপর মাথা রেখে মারা যায়। রূপাই দীর্ঘকাল পর ফিরে এসে সবকিছু জানতে পারে এবং শোক সহ্য করতে না পেরে নিজেও নিরুদ্দেশ হয়। এভাবেই সাজু ও রূপাইয়ের প্রেম এক করুণ লোকগাথায় পরিণত হয়।

ছ. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন বাংলা ছোটগল্পের জনক বলা হয়?**

নমুনা উত্তর : ছোটগল্প হলো সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটি ঘটনা বা অনুভূতিকে কেন্দ্র করে অল্প চরিত্র ও সংহত বর্ণনায় গঠিত এক সাহিত্যরূপ। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য—**"শেষ হয়েও হল না শেষ"**, অর্থাৎ গল্প শেষ হলেও তার ইঙ্গিত ও ভাবনা পাঠকের মনে থেকে যায়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলা ছোটগল্পের জনক বলা হয় কারণ তিনিই প্রথম ছোটগল্পকে আধুনিক, সংক্ষিপ্ত এবং শিল্পসম্মত রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আগে বাংলা গল্প ছিল অধিকাংশই উপাখ্যানভিত্তিক ও দীর্ঘ বর্ণনামূলক; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গল্পকে একটি কেন্দ্রীভূত আবেগ, নির্দিষ্ট সমস্যা এবং স্পষ্ট মানবিক অভিজ্ঞতার ওপর নির্মাণ করেন। তিনি গল্পে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, মানবমনের দ্বন্দ্ব, সৌন্দর্যবোধ এবং সমাজবাস্তবতার সূক্ষ্ম দিকগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেন। তাঁর ভাষা সহজ, মাধুর্যমণ্ডিত ও নন্দনঘন, যা ছোটগল্পকে কেবল একটি ঘটনা-বর্ণনা নয়, বরং একটি সম্পূর্ণ শিল্পমূর্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। 'পোস্টমাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'সমাপ্তি', 'অপরিচিতা', 'দেনাপাওনা'—এসব গল্পে যে মানবিক গভীরতা, বেদনাবোধ এবং সাংস্কৃতিক বাস্তবতা পাওয়া যায়, তা বাংলা ছোটগল্পকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি বিপুল সংখ্যক উচ্চমানের গল্প রচনা করে ছোটগল্পকে বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র, পরিণত সাহিত্যধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এসব কারণেই রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ অর্থে বাংলা ছোটগল্পের জনক বলা হয়।

জ. **নজরুলের 'নারী' কবিতায় নারী চেতনার স্বরূপ উল্লেখ করুন।**

নমুনা উত্তর : কাজী নজরুল ইসলামের 'নারী' কবিতাটি হলো সাম্য ও মানব-মর্যাদার এক বলিষ্ঠ ঘোষণা। কবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে নারী মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় অবদানশীল, সমানাধিকারী এবং অনুপ্রেরণাদাত্রী এক সত্তা।
নজরুলের নারী চেতনার মূল ভিত্তি হলো সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের ঘোষণা। কবি নারী-পুরুষের ভেদাভেদহীন দৃষ্টিতে ঘোষণা করেন:
"সাম্যের গান গাই — আমার চক্ষে পুরুষ-রমনী কোনো ভেদাভেদ নাই।"
এই চেতনার প্রমাণ মেলে মানবসভ্যতার সৃষ্টি ও কল্যাণে নারীর সমান অংশগ্রহণে, যা কবি দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরেন:
"বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"
নজরুল নারীকে কেবল কোমলতার প্রতীক হিসেবে দেখেননি, বরং তাকে শক্তি, সাহস ও বিজয়ের অপরিহার্য প্রেরণা হিসেবে চিত্রিত করেছেন। নারী কেবল বধু বা জননী নয়, সে হলো বিজয়-লক্ষ্মী:
"কোন কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারি, প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।"
সংগ্রাম ও ত্যাগের ক্ষেত্রেও নারীর ভূমিকাকে কবি মহিমান্বিত করেছেন। পুরুষ ইতিহাসে তার রক্তদানের স্বীকৃতি পেলেও, নারীর নিঃস্বার্থ ত্যাগ প্রায়শই উপেক্ষিত:
"কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে, কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।"
নারী যে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য এবং মর্যাদার অধিকারী, তা বোঝাতে কবি জ্ঞানের লক্ষ্মী থেকে শুরু করে সুষমা-লক্ষ্মীর আসনে তাকে বসিয়েছেন। নারী পুরুষের জীবনের মরু-তৃষ্ণা দূর করে শান্তির সুধা যোগায়:
"পুরুষ এসেছে মরুতৃষা লয়ে, নারী যোগায়েছে মধু।"
রাজ্যশাসন থেকে শুরু করে মানব-হৃদয় নির্মাণ—সবখানেই নারীর প্রভাব সুস্পষ্ট। পুরুষকে মানুষ করার দায়ও নারীর:
"পুরুষ হৃদয়হীন, মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ।"
এভাবে, 'নারী' কবিতায় নজরুল নারীকে সমানাধিকারী, সৃষ্টিশক্তির উৎস, সংগ্রামী, মর্যাদাময় ও মানবসভ্যতার অপরিহার্য অংশ হিসেবে চিত্রিত করেছেন; পঙক্তিগুলো নারী-চেতনার এক শক্তিশালী কাব্যিক দলিল।

ঝ. **আল মাহমুদের 'সোনালী কাবিন' কাব্যে মানবপ্রেম ও জীবনদর্শন কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে?**

নমুনা উত্তর : আল মাহমুদের 'সোনালী কাবিন' কাব্য বাংলা সাহিত্যের একটি অপরিহার্য কাব্য, যা মানবপ্রেম ও জীবনদর্শনের বহুমাত্রিক প্রকাশ। কাব্যটি কেবল রোমান্টিক প্রেম নয়, বরং মানুষের সহানুভূতি, মানবিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সৃষ্টিশীলতার প্রতিফলন। কবি লেখেন—
"সোনার দিনার নেই, দেন্মোহর চেয়ো না হরিণী
যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দু'টি।"
এই পঙক্তিতে দেখা যায়, মানবপ্রেম কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং দায়িত্ব ও স্নেহের প্রতীক।
কাব্যগ্রন্থে জীবনের বিভিন্ন দিক—প্রকৃতি, ইতিহাস, বিপ্লব, সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনা—সমন্বয়িতভাবে ফুটে উঠেছে। জীবনের সংগ্রাম, আনন্দ ও বিপর্যয় সবই মানবপ্রেমের অভিজ্ঞতার অংশ। কবি বলেন—
"মানব-জীবনও খুঁজে নেবে নিজের অনন্ত পথ।"
এখানে জীবনদর্শন বোঝানো হয়েছে, যা অন্তর্দৃষ্টি, দায়িত্বশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত।
'সোনালী কাবিন' কাব্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অনন্য, কারণ এটি অতীত ও বর্তমানকে একত্রে গাঁথে, গ্রামের ও শহরের জীবন, মানুষের আবেগ, সমাজ ও ইতিহাসকে সমন্বিতভাবে তুলে ধরে। কবি জীবনের সৌন্দর্য, প্রেম ও বিপ্লবকে একই ভঙ্গিতে প্রতিফলিত করেছেন।

ঞ. **জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতায় রোমান্টিকতার প্রকাশ কীভাবে ঘটেছে?**

নমুনা উত্তর : জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতায় রোমান্টিকতা প্রকাশ পেয়েছে প্রেমের নিরব, স্বপ্নীল ও শান্তিপূর্ণ অভিব্যক্তি হিসেবে। কবির চোখে বনলতা সেন কেবল নারী নয়, শান্তি ও প্রশান্তির প্রতীক, যা ক্লান্ত জীবনযাত্রার মাঝে অবসর ও প্রেরণা জুগায়। কবি লিখেছেন—
"হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে... আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।"
এই পঙক্তিতে দেখা যায়, দীর্ঘ যাত্রাপথে ক্লান্ত মন বনলতা সেনের উপস্থিতিতে শান্তি ও প্রফুল্লতা লাভ করছে।
রোমান্টিকতার আরও গভীর প্রকাশ পাওয়া যায় বনলতা সেনের সৌন্দর্য ও উপস্থিতিতে। কবি লিখেছেন—
"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;

অথবা,

... তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

রোমান্টিকতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কবি প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ও নিশীথের অন্ধকারের সঙ্গে প্রেমের অনুভূতি মিলিয়েছেন। তিনি লেখেন—
"সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে... থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"

এখানে রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশে প্রেমিকের অন্তর্মুখী অনুভূতি এবং বনলতা সেনের উপস্থিতি রোমান্টিক আবহ সৃষ্টি করছে।

বনলতা সেন কেবল নারী সৌন্দর্যের প্রতীক নয়, বরং প্রেমিকের ক্লান্তি ও জীবনের অস্থিরতা প্রশমিত করার শান্তির প্রতীক, যা কবিতায় রোমান্টিক আবহকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলে।

৫. **বাংলায় অনুবাদ করুন :** ১৫

** নির্দেশনা :

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক (ভাবানুবাদ) লিখলে সর্বোচ্চ ১১ - ১২ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ৭ - ৮, এভারেজ নম্বর ৯ - ১০।
iii. ভুল অনুবাদ লিখলে শুদ্ধ করে দিবেন প্লিজ।

Punctuality constitutes a fundamental imperative of professional decorum and individual rectitude. This discipline transcends mere adherence to a schedule; it corroborates an individual's unwavering commitment to the collective efficacy of any enterprise. Consistent timeliness functions as the silent prerequisite for earning credibility and fostering unwavering trust among all stakeholders. By proactively managing temporal resources and anticipating logistical exigencies, one demonstrates exemplary personal stewardship, thereby mitigating systemic friction and ensuring the seamless orchestration of objectives. Consequently, the cultivation of punctuality is recognized not merely as a beneficial habit, but as the visible expression of profound respect for shared time, accelerating both individual ascent and organizational recognition.

নমুনা উত্তর : সময়ানুবর্তিতা পেশাদার শালীনতা এবং ব্যক্তিগত নীতিনিষ্ঠার একটি মৌলিক ভিত্তি। এটি কেবল সময়সূচী মেনে চলার বিষয় নয়; বরং যেকোনো উদ্যোগের কার্যকারিতার প্রতি একজন ব্যক্তির অটল প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। ধারাবাহিক সময়ানুবর্তিতা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন এবং অংশীদারদের মধ্যে স্থায়ী বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য একটি নীরব পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। সক্রিয়ভাবে সময় ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও সম্পদসংক্রান্ত ব্যবস্থা পূর্বাভাস প্রদান করে, একজন ব্যক্তি দৃষ্টান্তমূলক ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান প্রদর্শন করে, যা পদ্ধতিগত ঘর্ষণ কমায় এবং লক্ষ্য পূরণের প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্নে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই সময়ানুবর্তিতা কেবল একটি উপকারী অভ্যাস নয়, এটি ভাগ করা সময়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার দৃশ্যমান প্রকাশ, যা ব্যক্তিগত উন্নতি এবং সাংগঠনিক স্বীকৃতিকে সমানভাবে ত্বরান্বিত করে।

৬. **বাংলাদেশের সরকারি চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও সহজ ও বেকারবান্ধব করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করুন।** ১৫

** নির্দেশনা :

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে সর্বোচ্চ ১১ - ১২ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ৫ - ৬, এভারেজ নম্বর ৭ - ৮।
iii. সংলাপ তথ্যবহুল ও গঠনমূলক লেখার জন্য গুরুত্ব দিবেন।
iv. ২/৩টি মন্তব্য লিখে দিবেন।

নমুনা উত্তর :

স্থান: ঢাকার একটি কফি শপ
সময়: সন্ধ্যা ৭টা
সংলাপকারীরা:
রাকিব: সমাজবিজ্ঞান গ্র্যাজুয়েট, দীর্ঘসময় সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছে।
ফারহান: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি ও বেসরকারি চাকরির জন্য পরীক্ষা দিয়েছে।
রাকিব: কেমন আছো ফারহান?
ফারহান: ভাল আছি। তুমি কেমনস আছো?
রাকিব: আমিও ভাল আছি। একটি বিষয় খেয়াল করেছ ফারহান- আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বিবিএস রিপোর্ট অনুযায়ী ২৬ লাখ, এর মধ্যে প্রায় ৯ লাখ উচ্চশিক্ষিত।
ফারহান: হ্যাঁ, আর প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি। প্রতি বছর নতুন করে লাখ লাখ তরুণ বেকার তালিকায় আসে।
রাকিব: শুধু সংখ্যা নয়, এই বেকারত্ব দেশের মানবসম্পদকে অকেজো করে দিচ্ছে।
ফারহান: আর নিয়োগ প্রক্রিয়া এমন জটিল! আবেদন ফরম, নথিপত্র যাচাই, লিখিত-মৌখিক—সবই সময়সাপেক্ষ।
রাকিব: স্বতন্ত্র নিয়োগ বোর্ড থাকলে, পুরো প্রক্রিয়া সহজ, দ্রুত ও বেকারবান্ধব করা সম্ভব।
ফারহান: হ্যাঁ, আর প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য আলাদা প্যানেল থাকলে দুর্নীতি কমবে।
রাকিব: সবচেয়ে বড় প্রয়োজন—প্রত্যেক জেলা ও বিভাগীয় শহরে পরীক্ষা আয়োজন করা।
ফারহান: একদম। এতে প্রার্থীরা ঢাকায় এসে ভাড়া খরচা করবে না। সময় ও টাকা দুটোই বাঁচবে।
রাকিব: আর ফি কমানো দরকার। একই গ্রেডের জন্য বারবার পরীক্ষা দিতে হলে ফি বেড়ে যায়।
ফারহান: হ্যাঁ, এবং একাধিক নিয়োগ পরীক্ষা একই দিনে না হলে প্রার্থীরা একাধিক পরীক্ষার চাপের মধ্যে পড়বে না।
রাকিব: কেন্দ্রীয় অনলাইন ডাটাবেজ থাকলে আবেদন ও তথ্য যাচাইও সহজ হবে।
ফারহান: এবং নিয়োগের সময়সূচি নির্দিষ্ট হলে দীর্ঘ প্রতীক্ষা কমবে। একবারে সব শ্রেণির পদে আবেদন করতে পারবে।
রাকিব: প্রাথমিকভাবে ফি কমানো, জেলা-শহরে পরীক্ষা, এবং একই দিনে একাধিক পরীক্ষা না হওয়া—এগুলো প্রক্রিয়াকে বেকারবান্ধব করবে।
রাকিব: এবং নিয়োগের সময়সূচি নির্দিষ্ট হলে বেকারদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা কমবে। একবারে সব শ্রেণির পদে আবেদন করতে পারবে, ফি সাশ্রয় হবে।
ফারহান: হ্যাঁ, এতে প্রার্থীর সময় ও খরচ বাঁচবে। আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে।

রাকিব: আর বেকারত্ব কমে যাবে, দেশের মানবসম্পদ কার্যকর হবে।
ফারহান: বিসিএস ছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ফি ৫০০ টাকারও বেশি, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতেও কম নয়—যদি একই গ্রেডের বিভিন্ন পদের জন্য বারবার আবেদন করতে না হয়, তাহলে প্রার্থীর জন্য সুবিধা হবে।
রাকিব: আর প্রিলিমিনারি-লিখিত-মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হলে প্রার্থী জানবে, তার কত নম্বর এবং কোন পর্যায়ে সে আছে।
ফারহান: দেখো, ৪৫তম বিসিএসে ৩ লাখ ৪৬ হাজার প্রার্থী, উত্তীর্ণ মাত্র ১২ হাজার! প্রতি ৩০ জনে একজন সুযোগ পাচ্ছে।
রাকিব: এতে তরুণরা হতাশ হচ্ছে, আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছে।
ফারহান: দেশের তরুণরা যদি দ্রুত চাকরি পায়, স্বচ্ছ ও বেকারবান্ধব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, তখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমে যাবে।
রাকিব: শুধু সরকারি খাত নয়, বেসরকারিতেও স্বচ্ছতা ও সহজ নিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ।
ফারহান: ঠিক। শিক্ষিত যুবকরা সুযোগ পেলে দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।
রাকিব: বেকারবান্ধব ব্যবস্থা ছাড়া এই সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়।
ফারহান: একদম। জেলা ও বিভাগীয় শহরে পরীক্ষা, ফি সাশ্রয়, একাধিক পরীক্ষা না থাকা—এসব থাকলে প্রার্থী হতাশ হবেন না।
রাকিব: আশা করা যায়, বাস্তবায়ন হলে শিক্ষিত যুবকেরা স্বপ্ন ও কর্মে নিজেকে প্রমাণ করতে পারবে।
ফারহান: আর দেশের শ্রমশক্তি অপচয় রোধ হবে।
রাকিব: জাতীয় অগ্রগতির জন্য এই পদক্ষেপগুলো জরুরি।

৭. **ক. ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন লিখুন।** ১৫

**** নির্দেশনা :** পত্রিকার সম্পাদকের নিকট বিষয়বস্তু উল্লেখ করে অভিমতটি প্রকাশের অনুমতি চাইবেন। বর্তমান অবস্থার কারণ ও প্রতিকারের জন্য করণীয় জানাবেন এবং শেষে খাম আঁকবেন। সর্বোচ্চ নম্বর ১১-১২, এভারেজ নম্বর ৯-১০। প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

নমুনা উত্তর :

ডেঙ্গু প্রতিরোধ: সতর্কতা ও সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি

ডেঙ্গু আমাদের দেশের জন্য এক ক্রমবর্ধমান হুমকি। ২০০০ সাল থেকে এই রোগের প্রাদুর্ভাব নিয়মিতভাবে বেড়ে চলেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৭,৪৬১, এবং মারা গেছেন ২৩৭ জন। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, চিকিৎসার তুলনায় প্রতিরোধই সবচেয়ে কার্যকর সমাধান।

ডেঙ্গু মূলত এডিস মশার বাহিত রোগ, যা ঘরবাড়ি, ছাদ, বারান্দা, স্কুল-কলেজ ও অফিসের আঙ্গিনায় সামান্য পানি জমে থাকা স্থানে ডিম পাড়ে। ছোট পানির মধ্যে এই মশা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। তাই রোগ প্রতিরোধে প্রথম ও প্রধান ধাপ হলো পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা। শুধুমাত্র স্প্রে ম্যানের ওপর নির্ভর করলে কার্যকর সমাধান সম্ভব নয়। প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ বাড়ি, স্কুল বা অফিসের আঙ্গিনা নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ডেঙ্গু প্রত entirely মানবসৃষ্ট এবং এর বিস্তার রোধে সরকার, সিটি কর্পোরেশন, বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং নাগরিক সকলকে অংশগ্রহণ করতে হবে। বিশেষতঃ:

* মশার বংশবিস্তার রোধে পানির জমে থাকা সমস্ত স্থান পরিস্কার করা।
* বাড়ির ছাদ, গাছের তলায় বা প্লাস্টিকের ভাঙা বাটিতে পানি জমতে না দেওয়া।
* কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে সঠিক ডোজ, স্থান ও সময় মেনে।
* স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সম্পৃক্ত করে সচেতনতা কার্যক্রম চালানো।
* মশা রোধে আধুনিক ল্যাব স্থাপন করে গবেষণা বৃদ্ধি।
* সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলো ইতোমধ্যেই সচেতনতা বৃদ্ধি, মশার লার্ভা নিধন এবং স্প্রে কার্যক্রম চালাচ্ছে। তবে এডিস * মশার আচরণ ও বসবাসের ধরন বুঝে আরও পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। গবেষণায় দেখা গেছে, এডিস মশা দেয়ালে কম বসে, বরং সোফা, টেবিল, জানালার পর্দা এবং ঝুলন্ত বিছানায় বসে, ফলে সহজে ধরা পড়ে না।

ডেঙ্গুর চিকিৎসা ব্যয়বহুল এবং নিম্নআয়ের মানুষের জন্য বিশেষভাবে কঠিন। চিকিৎসা খরচ ছাড়াও, আক্রান্ত ব্যক্তি কর্মক্ষমতা হারায় এবং পরিবারে আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয়। তাই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য অপরিহার্য।

ডেঙ্গুর প্রতিরোধে শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরের নাগরিক, এনজিও কর্মী, ডাক্তার, শিক্ষক ও রাজনৈতিক দলগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি ঢাকার কয়েকটি এলাকায় স্থানীয় স্কুল শিক্ষার্থী, কলেজ ছাত্রছাত্রী এবং সমাজসেবীরা অংশগ্রহণ করেছেন মশার লার্ভা ধ্বংস কর্মসূচিতে। এই ধরনের সমন্বিত উদ্যোগই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

ডেঙ্গু প্রত entirely মানবসৃষ্ট এবং পরিবেশ দূষণ, পানি জমে থাকা ও পরিচ্ছন্নতার অভাবের ফল। জনসচেতনতা, গবেষণা বৃদ্ধি, আধুনিক ল্যাব স্থাপন এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে, যাতে ডেঙ্গুর ঝুঁকি কমানো যায়। পরিবেশ রক্ষা, পরিচ্ছন্নতা এবং সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বন্ধ করা সম্ভব।

প্রতিবেদক: রাকিব হাসান
প্রকাশের তারিখ: ১৫ নভেম্বর ২০২৫
সংযুক্তি : ছবিঃ স্বাস্থ্যকর্মীরা স্প্রে মেশিন দিয়ে মশার লার্ভা ধ্বংস করছেন।

অথবা,

**** নির্দেশনা :**

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ii. পত্রের ৬টি অংশ ঠিক আছে কি-না দেখবেন প্লিজ
iii. সর্বোচ্চ নম্বর ১১-১২, এভারেজ নম্বর ৯-১০। সর্বনিম্ন ৬-৭

খ. বৈষম্য বিরোধী নতুন বাংলাদেশের কাছে প্রত্যাশা জানিয়ে বিদেশি বন্ধুর নিকট একটি পত্র লিখুন।

নমুনা উত্তর :

১৫ নভেম্বর, ২০২৫
বিজয় নগর, ঢাকা
প্রিয় জন,

আশাকরি ভাল আছো। তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ—২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ গণ–অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। স্বৈরতন্ত্র ও বৈষম্যমূলক শাসনের বিরুদ্ধে দেশের ছাত্র, যুবক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ একযোগে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এই আন্দোলনের সময় প্রায় ১,৪০০ মানুষ শহীদ হয় এবং হাজার হাজার আহত হন। পুরো জাতি ঐতিহাসিক ঐক্য প্রদর্শন করে, এবং এ আন্দোলনের পরই "বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠার আশা জাগে। জন, তোমার কাছে আমি চাই—এই ইতিহাস জানার মাধ্যমে আমাদের দেশের অর্জিত স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক চেতনা বোঝো।

বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারত্ব একটি বড় সমস্যা। প্রতি বছর প্রায় ১০–১২ লাখ শিক্ষার্থী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বের হয়, কিন্তু তাদের প্রায় ৪০% কোনো চাকরি পাচ্ছে না। সরকারি খাতের ধীর ও জটিল নিয়োগ, বেসরকারি খাতে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান না থাকা, এবং দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষার সামঞ্জস্যহীনতা শিক্ষিত তরুণদেরকে দীর্ঘ সময় বেকার রাখছে। নতুন বাংলাদেশে আমরা চাই—চাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সুযোগসমূহ সব নাগরিকের জন্য সমানভাবে পৌঁছাক। আর্থসামাজিক বৈষম্য দূর করা, দুর্নীতি হ্রাস করা এবং নারী ও সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত করা অত্যন্ত জরুরি।

জন, আমাদের দেশের প্রত্যেক নাগরিক আশা করছে একটি বৈষম্যবিরোধী, ন্যায্য ও স্বচ্ছ রাষ্ট্র গড়ে উঠুক। এতে সকল শ্রেণির মানুষ সমান অধিকার পাবেন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে উঠবে, এবং শ্রম ও শিক্ষা খাতে ন্যায্য সুযোগ সৃষ্টি হবে। নতুন বাংলাদেশে তরুণরা কেবল চাকরির জন্য নয়, নিজের উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা মনোভাব বিকাশের সুযোগও পাবে। সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষ—শিক্ষক, চিকিৎসক, এনজিও কর্মী, ছাত্র–ছাত্রী, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা—মিলে ক্রস-অ্যাকশন গ্রহণ করবে।

ডেঙ্গু, পরিবেশ দূষণ ও সামাজিক বৈষম্যের মতো সমস্যা আমাদের সমাজকে দুর্বল করছে। জন, আমরা চাই—নতুন বাংলাদেশে শুধুমাত্র সরকারের পদক্ষেপই নয়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতাও গুরুত্ব পাবে। প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমরা সমাজকে পরিচ্ছন্ন, ন্যায্য ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখব। শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রসার, এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি আমাদের দেশের তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে।

জন, তুমি আমাদের দূরবর্তী বন্ধু হলেও, তোমার সচেতনতা ও সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের নাগরিকদের কাছে বাংলাদেশের এই পরিবর্তন ও গণতান্ত্রিক অর্জনের কথা জানানো প্রয়োজন। তোমার মত বন্ধুদের সমর্থন আমাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে এবং বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এগিয়ে যাবে।

শেষে, আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই—নতুন বাংলাদেশে প্রত্যেক নাগরিককে সমান সুযোগ এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের সকলকে দায়িত্বশীল হতে হবে। শিক্ষিত তরুণরা যদি হতাশ না হয়, সঠিক সুযোগ পায়, তাহলে আগামী বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল, শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময়।

ইতি,
তোমার বন্ধু,
'ল'

By AIR	Stamp
From, L Bijoy Nagar Dhaka-1215, Bangladesh	To, John Smith 123 Green Street New York, United States

৮. বাঙালির ইতিহাস কিংবা লোকঐতিহ্য নির্ভর একটি গ্রন্থের সমালোচনা লিখুন। ১৫

** নির্দেশনা :

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ii. গ্রন্থ সমালোচনা না হলে তা কীভাবে লেখা উচিত তা লিখে দিবেন প্লিজ।
iii. গ্রন্থ সম্পর্কে উত্তরে ভুল লিখলে তা সংশোধন করে দিবেন প্লিজ।
iv. ৩/৪টি মন্তব্য লিখে দিবেন।
v. সর্বোচ্চ নম্বর ১১-১২, এভারেজ নম্বর ৯-১০, সর্বনিম্ন ৬-৭

নমুনা উত্তর :

** **গ্রন্থের নাম: "বাঙ্গালির ইতিহাস" (আদিপর্ব)**

লেখক : নীহাররঞ্জন রায়

প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৬ বাংলা (১৯৪৯ খ্রি.)

প্রেক্ষাপট : বাঙ্গালির ইতিহাস-ঐতিহ্যভিত্তিক

নীহাররঞ্জন রায় বাঙ্গালির ইতিহাস (আদিপর্ব) গ্রন্থে প্রাচীন বাংলা থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত এক নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন মূলত তার গ্রন্থটি কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপট নিয়ে নয়। তাঁর গ্রন্থে উঠে এসেছে প্রাচীন বাংলার রূপ ও প্রকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, শিলালীপি, জনপদ ও মানুষের কথা।

'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থটিতে ১৫টি অধ্যায় রয়েছে।

প্রথম অধ্যায় (ইতিহাসের যুক্তি) : এর মধ্যে বাঙালির ইতিহাস রচিত হয়েছে কেন? কিভাবে বাঙালির ইতিহাস গড়ে উঠেছে এবং ইতিহাস রচনার যুক্তিযুক্তকথা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় (ইতিহাসের গোড়ার কথা) : বাঙালি জাতি কোন জাতিগোষ্ঠী থেকে গড়ে উঠেছে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অর্থ, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বর্ণনা রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় (দেশ পরিচয়) : এখানে 'বঙ্গ' দেশের উল্লেখ ও বর্ণনা রয়েছে। 'বঙ্গ' নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়(ধন সম্বল) : বঙ্গ দেশে বিভিন্ন ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ তাঁর কথা জানা যায়। বাংলার ধন-সম্পদের পরিপূর্ণ নরক বলে অভিহিত করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায় (ভূমি বিন্যাস) : ভূমির বন্টন সীমানা, ক্রয়-বিক্রয়, আয়তন ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ফুটে ওঠে।

ষষ্ঠ অধ্যায় (বর্ণ বিন্যাস) : বর্ণ, গোষ্ঠী ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায় (শ্রেণিবিন্যাস) :

অষ্টম অধ্যায় (গ্রাম ও নগর বিন্যাস) :

নবম অধ্যায় (রাষ্ট্রবিন্যাস) :
দশম অধ্যায় (রাজবৃত্ত) :
একাদশ অধ্যায় (দৈনন্দিন জীবন) :
দ্বাদশ অধ্যায় (ধর্ম কর্ম) :
ত্রয়োদশ অধ্যায় (ভাষা সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা) :
চতুর্দশ অধ্যায় (শিল্পকলা) :
পঞ্চদশ অধ্যায় (ইতিহাসের ইঙ্গিত) :

নীহারঞ্জন রায় এই পনেরটি অধ্যায়ের মাধ্যমে বাংলার পূর্নাঙ্গ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা আর কোনো গ্রন্থে নেই। এ পর্যন্ত বাংলা বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্যভিত্তিক যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার মধ্যে নীহারঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাস সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি নিজেই বলেন- হয়তো এরপরও আরো কোনো গ্রন্থ রচিত হতে পারে। অর্থাৎ নিজের অকপটে নিজের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন। যদিও পাঠক হৃদয়ে কখনো এমনটা মনে হয়নি।

অনেক লেখক ও পাঠক গ্রন্থটি পড়েছেন এবং তাদের মন আলোড়িত করেছে। বাঙালির সত্যিকার ইতিহাস জানার জন্য গ্রন্থটি অনেক গুরুত্ববহ। যদিও এ গ্রন্থের শেষে তিনি উল্লেখ করেছেন– 'আমার কথাই শেষ কথা নয়।' তবুও নতুন কোনো ব্যাখ্যা ধর্ম রচিত না হওয়া পর্যন্ত নীহাররঞ্জন রায়ের এ গবেষণাধর্মী গ্রন্থই সর্বশ্রেষ্ঠ ও অন্যন্য।

*** **গ্রন্থের নাম : "বং থেকে বাংলা"**

লেখিকা : রিজিয়া রহমান

প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৮ খ্রি.

"বং থেকে বাংলা" লেখিকা রিজিয়া রহমানের অসাধারণ সৃষ্টি। বাংলা বলতে এখানে বিশেষত প্রাচীন 'বঙ্গ-সমতট' অঞ্চলকে বুঝিয়েছে। দশ অধ্যায়ে বিভক্ত উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায় বাঙালি জাতির বিবর্তনের এক একটা ধাপ। প্রতি অধ্যায়ে নতুন নতুন চরিত্র দিয়ে সেই সময়ের জীবনাচরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখিকা। এক অধ্যায়ের সাথে অন্যটির মেলবন্ধন তৈরি করেছে সময়। তাই সময়ই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

অনেক অনেক বছর আগের কথা। আর্যদের কাছে পরাজিত হয়ে জাহাজে করে পলায়নপর একদল দ্রাবিড় সমুদ্র দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে একজোড়া যুবক যুবতীকে ফেলে দেয় সমুদ্রে। ভাগ্য দেবতা তাদের ভাসিয়ে নিয়ে আসে সমতট অঞ্চলে। বং নামের যুবা পুরুষের হাত ধরে এলা নামের তরুণীটি পা রাখে সমতটের মাটিতে। তুলনামূলক সভ্য জগতের মানুষ দুটি এখানে খুঁজে পায় খানিকটা বন্য স্বভাবের কিছু নর নারীর। এরাই সমতটের আদি বাসিন্দা। এদের সাথে ভাব হয় আগুন্তুকদের। শুরু হয় বং বা বঙ্গ জাতির ইতিহাসের গল্প।

এরপর ক্রমান্বয়ে এসেছে বাঙ্গালি জাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস। দ্বিতীয় পর্বে দেখা গেছে সমতটে স্থলচর কৃষিজীবী মানুষ। পরের পর্বে এসেছে গোত্র প্রতিষ্ঠার প্রথা। এরপর মৌয, গুপ্ত, সেন, তুর্কি, মোঘল, ইংরেজ, পাকিস্তান শাসনামলে বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের কথকতা। বিভিন্ন জাতির শাসকদের দ্বারা শাসিত শোষিত হয়েছে বাংলার মানুষ। শাসকের হাতে ধর্ম হয়েছে শোষণের হাতিয়ার। বাংলার সাধারণ মানুষের কথা কেউ ভাবেনি। সবার চোখ ছিল সুফলা বাংলার সম্পদে। ১৯৭১ সালের সদ্য স্বাধীন বাংলায় এসে শেষ হয়েছে উপন্যাস।

দশ পর্বে বিভক্ত উপন্যাসের প্রতিটি পর্বই আলাদা একটা উপন্যাস হয়ে উঠতে পারার ক্ষমতা রাখে। যুগের চাহিদা অনুযায়ী আদিমকাল থেকে বর্তমান সময়ের আদলে চরিত্রগুলো বিন্যাস করা হয়েছে। শাসনকার্যে, ব্যবসা করতে, লুণ্ঠণ করতে, ধর্ম প্রচারে বিভিন্ন জাতির মানুষ এসেছে বাংলায়। বাংলার প্রেমেই হোক বা বাঙালি নারীর প্রেমেই হোক থেকে গেছে এখানো বাঙালির রক্তে তাদের রক্ত মিশে বাঙালির শারীরিক গঠনে এসেছে পরিবর্তন। পরিবর্তন এসেছে ভাষায়, এসেছে সংস্কৃতিতে। যুগে যুগে এইসব রূপান্তর মেনে নিয়েই আজকের বাঙালি জাতি। উপমহাদেশে সবার সাথে থেকেও বাঙালি তার নিজস্ব জাতিসত্ত্বাকে আলাদা রেখেছে সব সময়ই। প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে একটা স্বাধীন জাতি হিসেবে।

"বং থেকে বাংলা"য় ইতিহাসকে চাপিয়ে দেয়া হয়নি। বরং উপন্যাসের চরিত্ররা ইতিহাসকে ধারণ করে প্রাণবন্ত করেছে বর্ণনাকে। ইতিহাসে শাসকের জীবনীতে সাধারণ মানুষকে দেখতে হয়, উপন্যাসে সাধারণ মানুষের জীবনের অনুসঙ্গ হিসেবে এসেছে শাসকের কথা। ইতিহাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের সাথে লেখিকার কল্পনা শক্তি বাঙ্গময় করে তুলেছে গল্প। যুগে যুগে জীবনাচার, পোষাক, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, সবকিছুতেই ভিন্নতা এসেছে। শুধু অপরিবর্তিত থেকে গেছে মানুষের হৃদয়াবেগ... ভালোবাসায়, ঘৃণায়। আদিম 'বং- এলা' থেকে 'মিন্টু-রমিজা'র মধ্যে মানবিক পার্থক্য তাই খুব বেশি নয়। হাজার হাজার বছর সময়ের ক্যানভাসে লেখা উপন্যাসটি মুগ্ধ করবে পাঠককে।

৯. **যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন :** ৪০

** নির্দেশনা :

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক লিখলে সর্বোচ্চ ২৪ - ২৫ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ৮ - ১০, এভারেজ নম্বর ১৭ - ১৮।
iii. রচনায় তথ্য সংযোজন ও চিত্র (প্রয়োজনে), প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এবং উদাহরণসহ লেখার জন্য বলতে পারেন।

ক. সুনীল অর্থনীতি ও বাংলাদেশ

নমুনা উত্তর :

বেলজিয়ামের অর্থনীতিবিদ গুন্টার পাওলি ১৯৯৪ সালে প্রথম ব্লু ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতির ধারণা উপস্থাপন করেন। ব্লু ইকোনমি হলো সমুদ্র-নির্ভর অর্থনীতি, যেখানে সমুদ্র ও সমুদ্রতলের বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহার করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। এটি কেবল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, বরং মানবজাতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের উপায়। সমুদ্রের বিশাল জলরাশি, তলদেশের খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, জ্বালানি, পরিবহন ও পর্যটন সবই ব্লু ইকোনমির আওতায় পড়ে। জাতিসংঘ ব্লু ইকোনমিকে মহাসাগর, সমুদ্র এবং উপকূলীয় অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বিস্তৃত পরিসর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী সমুদ্র সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতি বছর বিশ্বের ৪৩০ কোটি মানুষের প্রায় ১৫ শতাংশ প্রোটিনের চাহিদা সামুদ্রিক মাছ, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদের মাধ্যমে পূর্ণ হয়। এছাড়া, পৃথিবীর প্রায় ৩০ শতাংশ গ্যাস ও তেল সরবরাহ করা হয় সমুদ্রের তলদেশের খনন ক্ষেত্র থেকে। বাণিজ্যিক পরিবহনের ৯০ শতাংশ সমুদ্রপথে সম্পন্ন হয়। ইউরোপের উপকূলীয় দেশগুলো তাদের অর্থনীতি থেকে প্রতিবার বিলিয়ন বিলিয়ন ইউরো আয় করে, যা তাদের জিডিপির প্রায় ১০ শতাংশের সমান।

বাংলাদেশের জন্য ব্লু ইকোনমির গুরুত্ব বিশেষভাবে বেশি। বঙ্গোপসাগরের তলদেশে বৈচিত্রময় খনিজ ও মৎস্যসম্পদ রয়েছে, যা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং অর্থনীতির সমন্বিত উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ৩০ লাখ পরিবার মাছ ধরা ও

সামুদ্রিক অর্থনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। লবণ উৎপাদনও দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বাংলাদেশের লবণ শিল্প প্রায় ২ হাজার ৫০০ থেকে ৩ হাজার কোটি টাকার অবদান রাখছে।

জাহাজ নির্মাণ ও পুনর্ব্যবহার শিল্পেও বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। বিশ্বে জাহাজ নির্মাণে ১৩তম এবং জাহাজ পুনর্ব্যবহারে ৩য় স্থান অর্জন করেছে। দেশের দীর্ঘ উপকূলীয় এলাকা, বিশেষত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে এই শিল্পকে পরিবেশবান্ধবভাবে সম্প্রসারণ করলে অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখা সম্ভব। পর্যটন খাতেও সম্ভাবনা প্রবল; কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন ও অন্যান্য দ্বীপ পর্যটক আকর্ষণে সক্ষম। বর্তমানে বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২৭ লাখ মানুষ কর্মসংস্থানে যুক্ত।

বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রসম্পদ কেবল অর্থনৈতিক নয়, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সামুদ্রিক জীব থেকে কসমেটিক, খাদ্য, ওষুধ ও পুষ্টি উপকরণ উৎপাদন সম্ভব। মেরিন শেলফিশ ও ফিনফিস ফার্মিংয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। তদুপরি, বঙ্গোপসাগরে হেভি মিনারেল, যেমন ইলমেনাইট, টাইটেনিয়াম অক্সাইড, রুটাইল, জিরকন, ম্যাগনেটাইট, মোনাজাইট, কোবাল্ট সহ মূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে, যা সঠিকভাবে আহরণ করলে বৈদেশিক মুদ্রার বিপুল যোগান দিতে সক্ষম।

বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমি উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১৭ সালে ব্লু ইকোনমি সেল গঠন করে সমন্বিত কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ২০১৯ সালে মেরিটাইম জোন অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছে, যা সমুদ্রসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে। আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের অতিরিক্ত সামুদ্রিক এলাকা অর্জন করেছে। এই জয় বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমি প্রসারে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

ব্লু ইকোনমি দুটি প্রধান ধরণের সম্পদ নিয়ে কাজ করে—প্রাণিজ এবং অপ্রাণিজ। প্রাণিজ সম্পদে রয়েছে মৎস্যসম্পদ, সামুদ্রিক প্রাণী, আগাছা ও জলজ উদ্ভিদ। অপ্রাণিজ সম্পদে রয়েছে তেল, গ্যাস, খনিজ, বালি, লবণ ও অন্যান্য খনিজ উপাদান। বর্তমান প্রায় ৫০০ প্রজাতির মাছ, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ২০ প্রজাতির কাঁকড়া, ৩৩৬ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক এবং শেলফিশ, অক্টোপাস, হাঙ্গরসহ বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী ব্লু ইকোনমির অন্তর্ভুক্ত।

সমুদ্রসম্পদ ব্যবহার করে নতুন খাতের উদ্ভাবনও সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, সামুদ্রিক শৈবাল প্রক্রিয়াজাত করে ওষুধ তৈরি, মাছের তেল থেকে স্বাস্থ্যকর পণ্য, মেরিন বায়োটেকনোলজি, জাহাজ নির্মাণ ও পুনর্ব্যবহার ইত্যাদি। ২৬টি সম্ভাবনাময় কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে সরকার, যার মধ্যে শিপিং, উপকূলীয় পরিবহন, সমুদ্রবন্দর সম্প্রসারণ, পর্যটন, মেরিন জেনেটিক রিসোর্স, ব্লু এনার্জি, সমুদ্রের লবণ উৎপাদন, খনিজ আহরণ, জাহাজ নির্মাণ ও পুনর্ব্যবহার, মৎস্যসম্পদ আহরণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

ব্লু ইকোনমি প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছানোর লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বা বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবস্থাপনায় অগ্রাধিকার প্রদান করছে। নতুন ব্লক ও খনন ক্ষেত্র, গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, পর্যটন সম্প্রসারণ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলে প্রতিবছর আড়াই লাখ কোটি ডলার অর্জন সম্ভব হবে।

তবে ব্লু ইকোনমির বিকাশের পথে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। পর্যাপ্ত নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনার অভাব, দক্ষ জনশক্তির ঘাটতি, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব, সম্পদের পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব, গবেষণা কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার অভাব এবং গবেষণা জাহাজ না থাকা এগুলো প্রধান প্রতিবন্ধকতা।

সামুদ্রিক দূষণ ব্লু ইকোনমির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। শিল্প-কারখানা, গৃহস্থালি বর্জ্য, জাহাজ ভাঙা, তেল নির্গমন, কৃষিক্ষেত্রের রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি দূষণের মূল উৎস। দূষণ সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য, মাছের প্রজনন, পর্যটন ও জনস্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। অতিমাত্রায় মাছ ধরা ও খনিজ আহরণও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে।

সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ রয়েছে। 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন', 'পরিবেশ সংরক্ষণ আইন' এবং সুনীল অর্থনীতি নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে আইন বাস্তবায়নে ঘাটতি, জনসচেতনতার অভাব এবং প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা সমস্যাকে জটিল করে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ, আধুনিক বর্জ্য শোধনাগার, পরিবেশবান্ধব জাহাজ ভাঙা, প্লাস্টিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যটন এলাকায় পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমির সাফল্য নির্ভর করছে দক্ষ মানবসম্পদ, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর। সমুদ্র গবেষণা জাহাজ, প্রশিক্ষিত সামুদ্রিক বিজ্ঞানী, নিয়মিত গবেষণা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং পরিবেশবান্ধব নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, নরওয়ে ও মালদ্বীপের মতো দেশগুলোর ব্লু ইকোনমি সাফল্য পরিবেশ সুরক্ষা ও টেকসই আহরণের ওপর নির্ভরশীল।

ব্লু ইকোনমি কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, বরং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের একটি কৌশল। বাংলাদেশের জন্য এটি খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সঠিকভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হলে বঙ্গোপসাগর ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য সমৃদ্ধ সম্পদভাণ্ডার হয়ে থাকবে।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, বাংলাদেশের ব্লু ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতি অপার সম্ভাবনার খাত, যা দেশের অর্থনীতি, পরিবেশ, সামাজিক উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তবে এই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে হলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং জনসচেতনতা একসাথে কার্যকর করতে হবে। যদি বাংলাদেশ সঠিকভাবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে, তবে সমুদ্র শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সম্পদের উৎস নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই, সমৃদ্ধ এবং জীবন্ত সম্পদ হয়ে থাকবে।

খ. বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প : সমস্যা ও সম্ভাবনা

নমুনা উত্তর :

বাংলাদেশ, যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যময় ল্যান্ডস্কেপের কারণে পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয়, তার পর্যটন শিল্প গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশটি, যেখানে পাহাড়ি এলাকা, নদী, হ্রদ, সমুদ্রসৈকত এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে, আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য একটি সম্ভাবনাময় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৬.৫ লাখ বিদেশি পর্যটক আগমন করেছে, যা কোভিড-পরবর্তী পুনরুদ্ধারের এক সুস্পষ্ট প্রতীক। এর পাশাপাশি, দেশীয় পর্যটকরা আভ্যন্তরীণ ভ্রমণে ব্যাপক আগ্রহ দেখাচ্ছে, যার ফলে অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পর্যটন শিল্পের অর্থনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৩ সালে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প দেশের মোট জিডিপিতে প্রায় ৪ শতাংশ অবদান রেখেছে। WTTC রিপোর্ট অনুযায়ী, পর্যটন খাত ২০২৩ সালে প্রায় ১.০২ ট্রিলিয়ন টাকা (প্রায় USD ৯.৫ বিলিয়ন) আয় করেছে এবং আগামী কয়েক বছরে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষ করে দেশীয় পর্যটকদের ব্যয় উল্লেখযোগ্য, যা ২০২৩ সালে প্রায় ৮৪৩.৬ বিলিয়ন টাকা পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক পর্যটকদের ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করছে।

পর্যটন শিল্প শুধু অর্থনীতিতে অবদান রাখছে না, এটি দেশের কর্মসংস্থানেও বড় ভূমিকা পালন করছে। ২০২৩ সালে পর্যটন খাতে প্রায় ২.১৪ মিলিয়ন মানুষ কাজ করছিলেন, যা মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৩ শতাংশ। এই সংখ্যার বৃদ্ধি, দেশের যুব সমাজকে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ দিচ্ছে, বিশেষ করে হোটেল, রেস্তোরাঁ, পরিবহন ও গাইড সেবা খাতে। WTTC অনুমান করছে, ২০২৪ সালে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং প্রায় ২.১৮ মিলিয়ন পর্যটক এই খাতে কর্মসংস্থাপিত হবেন।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বৈচিত্র্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবন, কক্সবাজারের বিশাল সমুদ্রসৈকত, সুন্দর পাহাড়ি অঞ্চল চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলা, সিলেটের চা বাগান ও নদীশহর রূপগঞ্জ, সকলই পর্যটকদের জন্য অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করে। দেশের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ

যেমন পহেলা বৈশাখের উৎসব, মহাস্থানগড়, লালবাগ কেল্লা, মহাস্থান এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শন পর্যটকদের জন্য একটি সাংস্কৃতিক শিক্ষার সুযোগও প্রদান করে। এই সব বৈচিত্র্য পর্যটকদের কেবল ভ্রমণের আনন্দ নয়, দেশের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য বোঝার সুযোগও দেয়।

তবে, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তা উদ্বেগ বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চল এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় পর্যটনকে প্রভাবিত করছে। আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা অভাব পর্যটকদের জন্য বড় প্রতিবন্ধকতা। এছাড়া, পর্যটন খাতের জন্য সরকারি বাজেটের পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের বাজেট ছিল প্রায় ৫,৬৯৫ কোটি টাকা, যা আগের বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় প্রায় ৬৫৫ কোটি টাকা কম। অর্থাৎ, পর্যটন শিল্পের বৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে বাজেটের ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও আন্তর্জাতিক বিপণন কৌশলও বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তথ্য ও পরিষেবা সম্প্রসারণ, অনলাইন বুকিং সুবিধা, সামাজিক মাধ্যমে প্রচার, এবং আন্তর্জাতিক পর্যটককে আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন ফেস্টিভ্যাল ও ইভেন্ট আয়োজন, সবই দেশের পর্যটন খাতকে শক্তিশালী করতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় এবং পেশাদার পর্যটন গাইড ও হোটেল ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন একেবারেই জরুরি।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায়, বাংলাদেশ জাতীয় পর্যটন বোর্ডের সঙ্গে সহযোগিতায় IPE Global-এর সাহায্যে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো ২০৪১ সালের মধ্যে ১০ মিলিয়ন পর্যটক আকর্ষণ করা এবং প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার আয় অর্জন করা। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দেশের পর্যটন শিল্পকে প্রযুক্তিগত, অবকাঠামোগত ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে হবে।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা অপরিহার্য। স্থানীয় জনগণ পর্যটকদের স্বাগত জানানোর সংস্কৃতি, স্থানীয় খাবার ও হস্তশিল্প বিক্রয়, এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলে, পর্যটকরা আরও সুখকর অভিজ্ঞতা লাভ করবে। এটি শুধু অর্থনৈতিক সুবিধা নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি বৃদ্ধিতেও সহায়ক।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের আরেকটি বড় সুযোগ হলো ইকোট্যুরিজম। সুন্দরবন, হিমালয়ী উদ্যান, হ্রদ এবং পাহাড়ি অঞ্চলগুলো ইকো-ভ্রমণকারীদের জন্য উপযুক্ত। সঠিক পরিকল্পনা এবং পরিবেশ বান্ধব নীতিমালা গ্রহণ করলে, এটি দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প দেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং স্থানীয় জনগণের সমর্থন ছাড়া এই খাতের পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। দেশের পর্যটন নীতি এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং বৈচিত্র্যময় পর্যটন গন্তব্যকে আরও উন্নত করা হলে, বাংলাদেশ একসময় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান পর্যটন গন্তব্যে পরিণত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প শুধু দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে না, এটি দেশের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এই শিল্পের বিকাশে সুষ্ঠু নীতি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, নিরাপত্তা, বাজেট বরাদ্দ এবং স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ একত্রে কাজ করলে, বাংলাদেশ বিশ্ব পর্যটনের মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হবে।

গ. বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্নীতি

নমুনা উত্তর :

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রায় সঙ্গতভাবে দুর্নীতি ও অস্থিরতার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং নৈতিক সংস্কৃতির স্তরে দুর্নীতি কেবল ব্যক্তিগত বা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নয়; বরং এটি একটি সুদীর্ঘ রাজনীতিক-প্রাতিষ্ঠানিক রোগ, যা দেশের বিকাশ, জনভালোবাসা ও শাসন ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

বর্তমান দুর্নীতির পরিসংখ্যান ও সামগ্রিক চিত্র

২০২৪ সালে Transparency International (TI) প্রকাশিত Corruption Perceptions Index (CPI) অনুযায়ী, বাংলাদেশের স্কোর দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৩ (০ থেকে ১০০ স্কেলে), যা গত ১৩ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। TI–বাংলাদেশ (TIB) জানিয়েছে, এই পতন মূলত "অসীম প্রতিরোধ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক প্রশ্রয় এবং আইন প্রয়োগে দুর্বলতা"–এর ফল। কোনো আত্মতুষ্টি নয়, কারণ এই স্কোর গড়ের চেয়ে অনেক নিচে: গ্লোবাল CPI গড় মাত্র ৪৩/১০০, এবং বিশ্বব্যাপী ১২২টি দেশ ৫০ স্কোরের নিচে রয়েছে।

র‍্যাঙ্কের দিক দিয়েও অবস্থা চরম: ১৮০ দেশ থেকে বাংলাদেশ ১৫১তম স্থানে।

TIB বলেছে, CPI-তে পয়েন্ট পতন গত কয়েক বছর ধরেই ঘটছে; উদাহরণস্বরূপ, ২০১২ থেকে ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশের CPI স্কোর ২৫–২৮ ছিল, যা ২০২৩-এ নেমে আসে ২৪ এবং ২০২৪-এ আরও কমে ২৩ এ।

একটি বিশেষ উদ্বেগ হলো জলবায়ু তহবিল। TIB উল্লেখ করেছে যে, বাংলাদেশের ক্লাইমেট ফান্ড (যেমন Climate Change Trust Fund) দুর্নীতির জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ; অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম এবং অসচ্ছতা এই তহবিলের বড় অংশকে গরিমাহীন করতে পারে। এইভাবে, ডিজিটাল বা নীরব বিম্বে নয় — পরিস্কার গাণিতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ডেটা দেখাচ্ছে যে দুর্নীতি এখন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থার এক গভীর ও পরিচালনাগত রোগ।

দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে গাঢ় পারস্পরিক নির্ভরতা রয়েছে। যখন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই তীব্র হয়, নির্বাচন প্রক্রিয়া অসচ্ছ হয়, প্রশাসনে দলীয়করণ ও সংকীর্ণ স্বার্থ আধিপত্য গড়ে তোলে — তখন দুর্নীতি প্রসার পায়। রাজনৈতিক অস্থিরতা নিজেই বিনিয়োগকারীকে দুহাই ঝুকি তৈরি করে, এবং অনিয়ম ও ঘুষ এমন ফর্ম নেয় যেখানে ক্ষমতাসীন শ্রেণি "চাপ মাপা, ভাগ বন্টা, লুটপ্রদর্শন" একরকম ন্যায্যতা হিসেবে দেখাতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক এলিটের গভীর সংযোগ এবং বৃহৎ অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলোর বরাদ্দ বা অনুমোদন প্রায়শই দুর্নীতিপূর্ণ চ্যানেল হিসেবে কাজ করে। এটি শুধু দেশীয় অর্থনীতিকে দুর্বল করে না, বরং বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও আস্থা নষ্ট করে। গঠনমূলক ও স্থিতিশীল রাজনৈতিক কাঠামোর অভাবে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর দমন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না, এবং অস্থিরতা আরও বাড়ে।

এছাড়া, রাজনৈতিক অস্থিরতা সামাজিক বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ন করে: বিঘ্নিত নির্বাচন, প্রতিপক্ষ দমনে আইন ও প্রশাসনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার — এসবের ফলে নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ বেড়ে যায়। জনগণের আস্থা কমে যায়, জনগণ বিশৃঙ্খলতা, অবিচার এবং দূর্নীতিকে সহ্য করতে বাধ্য হয়।

দুর্নীতি ও অস্থিরতা শুধু প্রশাসনিক নয়, অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া নিতান্ত প্রবল। নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলি বর্ণনামূলকভাবে খুব উদ্বেগজনক: বিনিয়োগে অব্যাহত প্রভাব: আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বিনিয়োগকারীরা রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্নীতির একত্রিত ঝুঁকিকে বড় বাধা হিসেবে দেখে। এর ফলে গৃহীত নতুন প্রোজেক্টে বিনিয়োগ কম হয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ধীর হয় এবং কর সংগ্রহ কমে যায়।

সরকারি ব্যয়ের অপচয়: দুর্নীতিপূর্ণ প্রকিউরমেন্ট, ভেজাল নির্মাণ এবং কমিশনভিত্তিক প্রকল্প বরাদ্দ রাষ্ট্রীয় অর্থকে শোষণ করে। অর্থনীতির মূল সিস্টেমে অর্থনৈতিক দক্ষতা নষ্ট হয়, কারণ প্রকল্পগুলো আসলে জনগণের জন্য নয়, বরং স্বার্থান্বেষণমূলক গোষ্ঠীগুলোর জন্য বরাদ্দ করা হয়।

সামাজিক অবিচার: দুর্নীতিতে দরিদ্র ও মাঝারি শ্রেণি সবচেয়ে ভোগে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচারব্যবস্থায় ঘুষগ্রহণ গুরুতর সামাজিক বৈষম্য তৈরি করে। জনগণ ন্যায্যতা থেকে বঞ্চিত হয়, আর সামাজিক আস্থা লুণ্ঠিত হয়।

আত্মসাহীদ অর্থ পাচার: যেসব রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নেতৃত্ব নিজেদের সুযোগ-সুবিধা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিদেশে সম্পদ সঞ্চয় করে — তারা মূলধন পাচার, কর-পরিহার ও অনিয়মে লিপ্ত থাকে। এটি দেশের আর্থিক সম্পদকে ক্ষয় করে এবং সামগ্রিক আর্থিক শক্তিকে দুর্বল করে তোলে।
TIB-এর প্রাতিষ্ঠানিক অভিমত স্পষ্ট: দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর লড়াই করার জন্য শুধুমাত্র আইন যথেষ্ট নয়, বরং রাজনৈতিক নেতৃত্বে "সততার অভিজ্ঞতা" এবং "স্বচ্ছতা/জবাবদিহিতা কাঠামো" গঠন অপরিহার্য। নির্বাচিত নেতা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক পার্টি যেন দুর্নীতির উৎপাদন ও প্রশ্রয় উৎস হিসেবে নয়; বরং দমনকারী হিসেবে কাজ করেন।

তাদের সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে —
'দুর্নীতি দমন সংস্থার (যেমন দুদক) স্বাধীনতা ও ক্ষমতা বাড়ানো;
রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সম্পদের বিবরণ বার্ষিক প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা;
রাজনৈতিক দলের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং বিদেশি অর্থ মধ্যস্থতার নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা;
ক্লাইমেট ফান্ডসহ জাতীয় উন্নয়ন তহবিলের ব্যবহার এবং তদারকিতে শক্তিশালী অডিট ও স্বচ্ছতা ব্যবস্থা গ্রহণ।
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত
বিশ্বব্যাপী অনেক উন্নয়নশীল দেশ দেখিয়েছে কীভাবে শক্তিশালী রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও স্বাধীন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে দুর্নীতি দমন করা যায়। যদিও প্রতিটি দেশের প্রেক্ষাপট ভিন্ন, কিছু সাধারণ শিক্ষা বাংলাদেশে প্রযোজ্য:

স্বাধীন তদন্ত সংস্থা: সিঙ্গাপুর, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ ও অন্যান্য কোথাও দুর্নীতি তদন্ত সংস্থা পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কাজ করে।
স্বচ্ছতা ও প্রাপ্যতা: তথ্যের প্রকাশ, ই-গভর্নেন্স এবং ডিজিটাল অডিট সিস্টেম দুর্নীতির সম্ভাবনাকে সীমিত করতে পারে।
দায়বদ্ধতা এবং শাস্তি: শক্তিশালী আইন, দ্রুত আদালতি প্রক্রিয়া এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দুর্নীতিবাজদের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করে।
নাগরিক অংশগ্রহণ: গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও নাগরিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা অপরিহার্য। তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে নজরদারি, রিপোর্টিং এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

চ্যালেঞ্জ ও বাধা : বাংলাদেশে যদিও স্পষ্ট সংস্কার প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা হয়েছে, তবে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে:
রাজনৈতিক পক্ষপাত ও লবিস্টিং শক্তি: ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অব্যাহত প্রভাব সংস্কারগুলিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার রাজনৈতিক করণীয়তা: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বা আইন প্রয়োগের স্বচ্ছতা এ পর্যন্ত পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
অর্থনৈতিক স্বার্থান্বেষণ: উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে ঘুষ বা কমিশনপ্রথার মধ্যে অংশগ্রহণকারীরা বাধাগ্রস্ত সংস্কারকে প্রতিহত করার প্রয়াস করতে পারে।
জনমত ও সামাজিক অবহেলতা: দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গভীরভাবে গড়ে ওঠেনি; অনেক সময় মানুষ ঘুষ বা অনিয়মকে "ভালভাবে কাজ করানোর একটি মাধ্যম" হিসেবে দেখার প্রবণতা রাখে।

বাংলাদেশের সামনে এখন একমাত্র বিকল্প হলো সামগ্রিক, গভীর ও পদ্ধতিগত সংস্কার। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্নীতির চক্র ভাঙতে হলে, দেশকে দরকার রাজনৈতিক অঙ্গীকার, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং এক শক্তিশালী অংশগ্রহণমূলক নাগরিক সমাজ। উচ্চ-যোগ্যতা বিশিষ্ট নেতৃত্ব, দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান, তথ্যপ্রবাহ ও শিক্ষিত নাগরিকরা মিলিতভাবে কাজ করলে—দুর্নীতিমুক্ত ও স্থিতিশীল বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন কেবল সম্ভব নয়, উত্তরাধুনিক বাস্তবতা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সময় আর ধারণক্ষমতা সীমিত; প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি সংস্কার এবং প্রতিটি পদক্ষেপ দেশের ভবিষ্যৎকে নির্ধারণ করবে। যদি এই সন্ধিক্ষণ হারিয়ে যায়, তাহলে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার জন্য যাত্রা আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

ঘ. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার

নমুনা উত্তর :

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল তৃতীয়-অর্থনীতি দেশ, যেখানে সাধারণ মানুষের শান্তিপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন বজায় রাখা ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষত দ্রব্যমূল্য (মূল্যস্ফীতি) বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ সহ জিবন প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য দ্রুত বাড়ার ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনমান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সমস্যার গভীরতা বোঝতে হলে মূল্যস্ফীতির ইতিহাস, গতি, কারণ ও তার প্রভাবের বিস্তৃত বিশ্লেষণ অপরিহার্য।
দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রা একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। যখন খাদ্য, ফুয়েল, ইউটিলিটি এবং অন্যান্য অপরিহার্য দ্রব্যের দাম বাড়ে, তখন সাধারণ মানুষ, বিশেষত নিম্নমধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক চাপ অত্যধিক হয়ে ওঠে। তাদের মাসিক আয়ে এমন বাড়তি ব্যয় যুক্ত হলে:
খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকে পড়ে — অল্প আয়ের পরিবারগুলো কম পুষ্টিকর খাবার কিনতে বাধ্য হয়।
স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ক্ষুন্ন হয় — বিপুল ব্যয় এবং সীমিত সংস্থান রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় ব্যয় বাড়ায়।
সঞ্চয় ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কঠিন হয় — বাড়তি খরচ মানুষের সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ করার সক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়।
সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় — দারিদ্র্য ও অসন্তোষ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্বেগ ও উত্তেজনার কারণ হতে পারে।
এইভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কেবল অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক বিরূপতার একটি শক্তিশালী উৎস হিসেবেও কাজ করছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান প্রবণতা: বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির ইতিহাস বহুস্তরীয়। সাম্প্রতিক দশকে, বিশেষত ২০২০-এর পর পরিস্থিতি তীব্র হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা (Bangladesh Economic Review)–২০২৪ অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৭৩ %, যেখানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১০.৬৫ % ছিল। বিজ রিপোর্ট অনুসারে, নভেম্বর ২০২৪-এ খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৩.৮% পর্যন্ত পৌঁছায়, যা সাধারণ মূল্যস্ফীতিকে ১১.৩৮%-এ ঠেলে দেয়। একইভাবে, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন জানায় যে Q2 (অক্টোবর–ডিসেম্বর) ২০২৪ সময়ের CPI (ভোক্তা মূল্য সূচক) ছিল অত্যন্ত উচ্চ, বিশেষত খাদ্য ক্ষেত্রে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু শিথিলতা লক্ষ্য করা গেছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ গোল খাবারমূল্যস্ফীতি ৯.২৪% এ নেমেছে, যার প্রভাব সামগ্রিক মূল্যস্ফীতিতেও প্রতিফলিত হয়েছে (মার্চ ২০২5-এ CPI ছিল ৯.৩২%)। জুন ২০২৫-এ, BBS তথ্য অনুযায়ী ইনফ্লেশন ৮.৪৮% এ নেমেছে, এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৭.৩৯% হয়েছে। তবে আশঙ্কার বিষয় হল জুলাই ২০২৫-এ পুনরায় ইনফ্লেশন বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিয়েছে, যখন বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি আবার উঠেছে ৮.৫৫% এ।

মূল্যবৃদ্ধির কারণ: দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনে একাধিক গাণিতিক ও কাঠামোগত কারণ রয়েছে। এসব কারণ একে অপরের সঙ্গে জটিলভাবে যুক্ত এবং প্রস্তাবিত সমাধানগুলোও তাই বহুমাত্রিক হতে হবে।

সরবরাহ-চাহিদার বৈসাম্য এবং মৌসুমী ঝরঝরা: গ্রামের উৎপাদন সীমিত এবং শহরে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় মৌলিক খাদ্য দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ—যেমন বন্যা—ফসলের উৎপাদনকে ভাসিয়ে নেয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ইতিহাসিকভাবে আমন ধানের ক্ষতি ঘটে, যার ফলে চালের দাম বিকল্প উৎস না পেয়ে বাড়ে।

বাজেট এবং আমদানি নির্ভরতা : বাংলাদেশ অনেক খাদ্যপণ্যের ওপর আমদানি নির্ভর। যখন আন্তর্জাতিক বাজারে শস্য বা তেলের দাম বাড়ে, তখন আমদানির মূল্য বাড়ি যায় এবং সেই বাড়তি ব্যয় ভোক্তার ওপর প্রতিফলিত হয়। তদুপরি, টাকার মান কমে গেলে আমদানির ব্যয় আরো বেড়ে যায়, যা মূল্যস্ফীতিকে আরও ত্বরান্বিত করে।

চোরাচালানি ও সিন্ডিকেট : পণ্যমজুত ও কৃত্রিম সংকট তৈরি করার জন্য অসাধু ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট গঠন করে কাজ করে। এরা পাইকারি পর্যায়ে অনেক পণ্য কেনে এবং গোপনভাবে মজুত রাখে, যা বাজারে কৃত্রিম ঘাটতি তৈরি করে। পরে বাজারে সীমিত পরিমাণ পণ্য ছাড়ার মাধ্যমে দাম নিয়ন্ত্রণ ও বৃদ্ধি করার ক্ষমতা তাদের থাকে।

অস্থায়ী নীতিমূলক ব্যবস্থাপনা: ধীরগতির বা অপর্যাপ্ত নীতিমূলক পদক্ষেপ, পর্যাপ্ত মনিটরিং ও মূল্যতালিকা প্রয়োগের অভাবে ব্যবসায়ীদের দায়বদ্ধতা কম হয়। কিছু ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ আদালত বা স্থানীয় প্রশাসন শাস্তি প্রদান করলেও তা পর্যাপ্ত নয় এবং দৃষ্টান্তমূলক ব্যাহত হয়।

মুদ্রানীতি ও সুদের হার : মুদ্রানীতি ও সুদের হার বৃদ্ধির ফলে ঋণগ্রহীতাদের ঋণ ব্যয় বাড়ে এবং ব্যবসায়ীদের উৎপাদন ব্যয় বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো রেট বাড়িয়েছে, যা অর্থস্রোতকে সংকুচিত করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছিল।

আবহাওয়াগত ঝুঁকি এবং জলবায়ু পরিবর্তন : বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন একটি চিরস্থায়ী চ্যালেঞ্জ। অতিবৃষ্টিপাত, বন্যা ও ভ্রমণকারী বন্যাপথ গ্রামীণ কৃষি উৎপাদনে বড় ধরণের বিঘ্ন সৃষ্টি করে, যা সরবরাহ চেইনকে দুর্বল করে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব: সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব কেবল অর্থনৈতিক সীমায় সীমাবদ্ধ নেই; এটি সামাজিক স্থিতিশীলতা, মানসিক সুস্থতা এবং নিরাপত্তার ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে।

পুষ্টিহীনতা ও খাদ্য নিরাপত্তা: উচ্চ খাদ্যমূল্যের কারণে দরিদ্র পরিবারগুলো প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য উপযোগীভাবে খেতে পারে না। এটি শিশু ও বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায় এবং অপুষ্টি ও রোগপ্রবণতা বাড়ায়।

আর্থিক চাপ ও সঞ্চয় হ্রাস: বাড়তি খরচ মানুষের মাসিক বাজেটকে সংকুচিত করে, সঞ্চয় এবং ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের সুযোগ কমিয়ে দেয়।

সামাজিক অস্থিরতা: মূল্যবৃদ্ধির চাপে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন, বিক্ষোভ ও অনিয়মে লিপ্ত হতে পারে। অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ে এবং সামাজিক আস্থা নষ্ট হয়।

শিল্প ও উৎপাদন কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত: উৎপাদন ব্যয়ে উচ্চতা এবং চাহিদার অস্থিরতা ব্যবসায়ী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, যা শিল্প দমনে এবং চাকরি হ্রাসে অবদান রাখতে পারে।

মানসিক চাপ: ক্রমাগত বাড়তে থাকা জীবনের ব্যয় এবং নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে, বিশেষত নিম্নআয়ের মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও হতাশা বাড়ায়।

নীতিগত সমাধান এবং সুপারিশ : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা রোধ করতে একটি সমন্বিত এবং বহুস্তরীয় নীতিমূলক কাঠামো অপরিহার্য।

সাপ্লাইচেইন এবং কৃষি উৎপাদন সম্প্রসারণ: উচ্চফলনশীল বীজ, উন্নত সেচব্যবস্থা ও কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। শীতকালীন এবং মরসুমীয় ফসলগুলোর জন্য ঠাণ্ডা আমান প্রকল্প ও কোল্ড স্টোরেজ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। কৃষকদের সহজ ঋণ, ভর্তুকি এবং বীমা প্রদান, বিশেষত প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায়।

মূল্যতদারকি ও বাজার নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালীকরণ: দোকান এবং পাইকারি পর্যায়ে বাধ্যতামূলক মূল্যতালিকা এবং সেই তথ্য গ্রাহকদের জন্য স্বচ্ছ করা।ভ্রাম্যমাণ আদালত ও স্থানীয় প্রশাসনকে বাজার তদারকিতে অধিক ক্ষমতা ও রিসোর্স দিয়ে সৃষ্টিকর্তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সিন্ডিকেট, মজুদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত দণ্ডনীতি ও তদন্ত গঠন করা।

মুদ্রানীতি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা: সুদের হার ও মুদ্রা নীতিতে এমন সমন্বয় রাখা যা অর্থব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখে এবং ঋণব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমন্বিত নজরদারি বৃদ্ধির নীতি প্রয়োগ করা।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও আমদানি নীতি পুনর্মূল্যায়ন: খাদ্য অনির্ভরতা কমাতে আমদানিতে সাশ্রয়ী নীতি চালু করা।

পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাজারে রিস্ক ম্যানেজমেন্টের জন্য স্টক পুলিং, রিজার্ভ ও বহুমুখী আমদানি পথ গঠন করা। প্রতিবেশী ও আন্তর্জাতিক দেশগুলোর সঙ্গে একসাথে খাদ্য নিরাপত্তা নীতি গঠন ও সমন্বয় বৃদ্ধি করা।

সামাজিক সুরক্ষা ও ভোক্তা অংশগ্রহণ: দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য ভর্তুকি, টিসিবি (Trading Corporation of Bangladesh) মাধ্যমে কমদামী খাদ্য প্রকল্প সম্প্রসারণ। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি, নাগরিক রিপোর্টিং প্ল্যাটফর্ম এবং গ্রামীণ পর্যায়ে ভোক্তা সংগঠন গঠন। ব্যয়বৃদ্ধির প্রকৃত প্রভাব মোকাবিলায় সশস্ত্র সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক ও সহায়তা কর্মসূচি চালু করা।

দূরদর্শী প্রকল্প ও জলবায়ু অভিযোজনা: জলবায়ু-প্রতিরোধক কৃষি ও বন্যামুক্ত ফসল সম্প্রসারণ। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে দ্রুত পুনরুদ্ধার নীতিমালা ও রিসোর্স বরাদ্দ করা। কৃষি গবেষণা ও উদ্ভাবনী পন্থায় বিনিয়োগ বাড়িয়ে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।

উপসংহার : বাংলাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি একটি যুগোপযোগী ও গূঢ় চ্যালেঞ্জ। এটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উদ্বেগ নয়, বরং সামাজিক ন্যায্যতা, নিরাপত্তা এবং জনগণের মৌলিক জীবনযাত্রার অধিকারকে হুমকির মুখে ফেলেছে। গড়ে উঠতে পারে খাদ্য-অসমতা, পুষ্টিহীনতা, দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং সামাজিক অস্থিরতা। তবে সমাধান আছে। এটি একটি রুটিন সমস্যা নয় যা শুধুমাত্র মুদ্রানীতি দিয়ে সমাধান করা যাবে; প্রয়োজন গঠনমূলক ও বহুমাত্রিক নীতি, স্থায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি, শক্তিশালী বাজার নিয়ন্ত্রন এবং জনগণের অংশগ্রহণ। সরকার, বেসরকারি খাত, কৃষক, ভোক্তা ও আন্তর্জাতিক অংশীদাররা যদি যৌথ ও দীর্ঘমেয়াদী নীতিনির্ধারণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তাহলে আমরা দ্রব্যমূল্যের এমন এক বাস্তবতা গড়তে পারি যেখানে জীবনযাত্রা তার মৌলিক মর্যাদায় নিশ্চিত থাকবে। শুধুমাত্র তাই নয় — বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক উন্নয়নও সুনিশ্চিত করা হবে।